ড. ইউনূসের নোবেল এবং আমাদের গৌরব অথবা গাত্রদাহ

মুহম্মদ জুবায়ের

গৌরবপর্ব ১

ডালাসের মাহবুবুর রহমান জালাল রোজার মাসে ভোর চারটায় সেহরি করে আর ঘুমাতে যান না। সকালে অফিসে যাওয়ার জন্যে তৈরি হওয়ার সময় পর্যন্ত ইন্টারনেটে বাংলাদেশ সম্পর্কিত যা কিছু পাওয়া যায়, তা পড়েন এবং সংগ্রহ করেন। বস্তুত, তাঁর বাড়িটি বাংলাদেশ বিষয়ে বইপত্র, তথ্য, ছবি, চলচ্চিত্র, গান এইসবের একটি খুদে জাদুঘরবিশেষ। বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, সংস্কৃতি সবই তাঁর আগহের বিষয়। অক্টোবরের ১৩ তারিখের ভোরে, তখন বাংলাদেশে বিকেল হয়ে গেছে, কমপিউটার খুলে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জনের সংবাদটি তিনি পেয়ে যান। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। সংবাদটি পড়তে পড়তে তাঁর বুক ভরে ওঠে গর্বে, আনন্দের অশ্রু চোখের সামনে কমপিউটারের পর্দাটিকে ঝাপসা করে দিয়েছে। তাঁর মনে হয়, বাঙালিও পারে।

আটলান্টার বাসিন্দা আবু জাফর খবর পেয়েছেন অফিসে পৌঁছে। উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান তিনি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে খবরটি সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তা যেহেতু অনুচিত হয়, ওই মুহূর্তে যা সম্ভব তিনি সেই কাজটি করেন। সেলফোনে আমেরিকায় বসবাসকারী যতো বাঙালির নম্বর আছে, একে একে সবাইকে ফোন করেন। চুলোয় যাক সব করণীয় কাজ। একদিন কাজ না করলে কী হয়? চাকরি যাবে? যাক, আজ এই আনন্দ ও গর্বের দিনে চাকরির নিরাপত্তাও গৌণ। অফিসের সহকর্মীদের টেবিলে ঘুরে ঘুরে একজন বাঙালির নোবেল জয়ের সংবাদটি জানানোর সময় অহংকারে তাঁর মাটিতে পা পড়ে না।

বস্টনের ড. আবদুল্লাহ শিবলী ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে খবর পেয়েছেন, তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন তাঁর বন্ধু বদিউজ্জামান নাসিমকে। বাঙালির নোবেল জয়ের খবরে ঘুম টুটে যায়, নাসিমের মনে পড়ে, বছর দুয়েক আগে বস্টনে এক অনুষ্ঠানে ড. ইউনুসের সঙ্গে পরিচয় ও একান্তে কথা বলার সুযোগ হয়েছিলো তাঁর। বড়ো মাপের কর্মীপুরুষটির কাজের স্বীকৃতি খুবই আনন্দদায়ক, গর্বের তো বটেই।

লস অ্যাঞ্জেলেসের এক গৃহিনী নাফিসা চৌধুরী খবর পেলেন দুপুরে রান্না করার সময়। রান্না বন্ধ করে একা ঘরে তিনি কাঁদতে বসলেন। আনন্দে, গর্বে।

১৪ তারিখ শনিবার সকালে কিশোরী তিয়াসা বাসার বাইরে থেকে ডালাস মর্নিং নিউজ তুলে আনতে আনতে প্রতিদিনের মতো শিরোনামগুলি দেখে। প্রথম পাতায় একটি বিশাল ছবিতে তার চোখ আটকে যায়। কাগজ নিয়ে ভেতরে ছুটে যায় সে, বাবা দেখো দেখো, বাংলাদেশের খবর!

কানাডার নায়াগ্রা অঞ্চলে একা বাস করেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি অলকা ঘোষ। তিনি ফোন করেছেন বাংলাদেশের মাহবুবা খানম কুঞ্জকে। বললেন, কুঞ্জ, ড. ইউনূসের নোবেল পাওয়ার খবরে এতো খুশি লাগছে! আমি তো বাংলাদেশের কাউকে চিনি না, তাই তোমাকেই অভিনন্দন জানাই।

ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল জয়ের সাফল্য ও স্বীকৃতিতে এই ধরনের ঘটনা সারা পৃথিবীর বাঙালিদের মধ্যে ঘটেছে। প্রত্যেকেই এরকম দু'দশটা উদাহরণ দিতে পারবেন। অক্টোবরের ১৩-১৪ তারিখে দু'জন বাঙালি কথা বলেছেন অথচ ড. ইউনূসের প্রসঙ্গ তুলে আনন্দ প্রকাশ করেননি, এমন খুব কমই ঘটেছে বলে অনায়াসে অনুমান করা চলে। ইমেল চালাচালি হয়েছে। আমি নিজেও পেয়েছি বেশ কিছু। পুরনো বন্ধু আবু নাসের ঢাকা থেকে লিখেছে, বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে এখন আমরা অহংকার করতে পারি। ডেলাওয়্যার থেকে সৈয়দ ওবায়দুর রহমানের ইমেল ভাষ্যও প্রায় একই রকমের।

১৩ তারিখে দিনভর ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে খবরটি পড়ছিলাম। বিকেলের দিকে ঢাকার ৭-৮টা দৈনিক কাগজও পড়া হলো। বেশ রাতে কানাডার ভ্যানকুভার থেকে আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই প্রিন্সের কাছ থেকে সর্বশেষ ফোন এলো। সারাদিন কাজে ছিলো বলে জানতে পারেনি, ইন্টারনেটে খবর পেয়েছে সে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে। অকপটে জানালো, বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, খবরটা পড়তে পড়তে আমি কেঁদে ফেলেছি।

হাজার হাজার মাইলের দূরত্বে থেকে আমরা প্রতিদিন আমাদের দেশ নিয়ে নানারকম দুঃসংবাদ শুনতে অভ্যস্ত। সুতরাং এক বাঙালি এবং বাঙালি প্রতিষ্ঠানের যৌথ নোবেল পুরস্কার জয়ে এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাস যে আমাদের আপ্লুত করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? বুকের ছাতি দুই ইঞ্চি ফুলে ওঠার মতো এই ধরনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না। ৯৯ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে গৌরব বোধ করেছিলাম আমরা। তারপর ক্রিকেটে আরো দুয়েকটি সাফল্য আমাদের আনন্দিত করেছিলো। কিন্তু তা বিশ্বজয়ের এই আনন্দের সমকক্ষ ছিলো না। এর সঙ্গে তুলনীয় সম্ভবত ১৯৭১-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ঘটনাটি। সেই সময়ে পৃথিবীতে তথ্যপ্রবাহ এতো ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী ছিলো না বলে প্রচারে আমাদের স্বাধীনতার ঘটনাটি বিশ্বময় এতো আলোড়নের কারণ হয়নি, যদিও প্রতিটি বাঙালি অনুভব করেছিলো সেই গৌরব।

গৌরবপর্ব ২

তোমার দেশ কোথায়?

বাংলাদেশ।

সেটা কোথায়?

দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারতের পাশে।

ও, ভারত। তাই বলো।

বাংলাদেশের বাইরে এই ধরনের কথোপকথনের অভিজ্ঞতা হয়নি, এমন বাঙালি একজনও পাওয়া যাবে না তা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। এতোসব ব্যাখ্যা করার ঝামেলা এড়ানোর জন্যেই হোক বা হীনমন্যতার কারণেই হোক, বাংলাদেশের কেউ কেউ নিজেদের সরাসরি ভারতীয় পরিচয় দিতেন, তা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি। কী লজ্জা, কী লজ্জা! মনে আছে, ১৯৮০ সালের অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পরিচয় দেওয়া হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তান বলে। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

এই লেখাটি লেখার সময় একটি ফোন পেলাম। বস্টন থেকে নূরুল হক বাচ্চু, বাংলাদেশের অনেক সফল চলচ্চিত্রের নির্মাতা। জানালেন, তাঁর কর্মস্থলে যে আমেরিকান সহকর্মীরা এতোদিন তাঁকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য, দুর্নীতি, বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস নিয়ে কথা বলে বিব্রত করতো, তারা আজ আগ বাড়িয়ে এসে বলেছে, আরে তোমার দেশ তো নোবেল জিতেছে!

আজ এই ২০০৬ সালে, স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরে, বাংলাদেশের নাম-পরিচয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়তো ফুরলো। নোবেল-বিজয়ের ফলে আজ সারা পৃথিবী জানে, সম্পদে দরিদ্র মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ যা সারা পৃথিবীর বহু দেশে সফল মডেল হিসেবে স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়।

গাত্রদাহপর্ব

লজ্জার কথা, এই পুরস্কার নিয়ে অনেক ধরনের কিন্তু কিন্তু শোনা যাচ্ছে। আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের একটি বোধহয় এই যে, কেউ আমাদের অর্জনের স্বীকৃতি দিলে আমরা তা গ্রহণ করতে জানি না এবং এক অদ্ভুত মানসিকতার কারণে কারো সামান্যতম সাফল্যও আমাদের সন্দেহের উদ্রেক করে। আমরা ক্রমাগত কূট প্রশ্ন তুলতে থাকি। সারা পৃথিবীর সমস্ত বাঙালি যখন ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল জয়ের অহংকারে উদ্ভাসিত হচ্ছে, কেউ কেউ এরই মধ্যে গম্ভীর মুখ করে নানান কথা বলতে শুরু করেছেন।

একজন লিখেছেন, আমাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক গভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আরেকজন সবজান্তার ভঙ্গিতে বলেছেন, আছে আছে, আরো কথা আছে, গরিবের গরিবি নিয়েও যে ব্যবসা করা যায়, ইউনূস তা-ও দেখালেন। আরেকজনকে বলতে দেখছি, গ্রামীণ ব্যাংক রক্তচোষা প্রতিষ্ঠান, গরিবের রক্ত খেয়েই তারা এতো বড়ো হলো, নোবেল পেলো।

আরো মজার কথা, আদর্শগতভাবে দুই জানের দুশমন আবদুল গাফফার চৌধুরী ও বদরুদ্দীন উমর একটি বিষয়ে এবার একমত হয়েছেন (সম্ভবত এই প্রথম) যে, ড. ইউনূসের নোবেলপ্রাপ্তি সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের ষড়যন্ত্রের ফল এবং তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট করার পরিকল্পনার একটি ধাপ। ড. ইউনূসের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আছে কি না আমার জানা নেই। যদি থাকেও, তা দোষের হবে কেন? বাংলাদেশে অসংখ্য দাগী অপরাধী, সন্ত্রাসী এবং প্রকাশ্যে অপরের সম্পদ লুণ্ঠনকারীরা জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতির রুস্তম হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারলে ইউনূসে আপত্তি কেন?

একটি ইফোরামে একজন গ্রামীণ ব্যাংকের 'সন্দেহজনক' কাজকর্ম সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের বিবরণ (এটি ১৯৯৫ সালে তৈরি) নির্দেশ করেছেন। অনেক উদ্ভট তথ্য আছে এই বয়ানে। একটির উল্লেখ করি। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের মানুষদের যৌতুকবিরোধী হতে দীক্ষা দিয়ে থাকে। বোঝা গেলো না, এই বিষয়টি নিন্দনীয় কীভাবে হলো? বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে, তাঁরা জানেন যুগ যুগ এই অভিশপ্ত পণপ্রথাটি কতো লক্ষ লক্ষ পরিবারের, বিশেষ করে ক্ষমতাহীন নারীর, সর্বনাশ করেছে এবং এই একবিংশ শতাব্দীতেও করে। নোবেল ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নিয়ে সংশয় কারো থাকতেই পারে, কিন্তু এই ধরনের অখ্যাত কোনো প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট নিয়েও তো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। পারে না?

এখন যদি পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নিন্দুকরা প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঈর্ষাপরায়ণ অন্য কোনো এনজিও বা বহুজাতিক মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলির প্রতিনিধিত্ব করছেন? অথবা বাংলাদেশের গ্রামে নারীর ক্ষমতায়নের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কোনো পক্ষের হয়ে ওকালতি করছেন? আমি বলছি না এগুলি সত্যিকারের অভিযোগ, কিন্তু এই প্রশ্নগুলি তোলার সুযোগ নিশ্চয়ই থাকে।

নোবেল বিজয়ী দ্বিতীয় বাঙালি অমর্ত্য সেন তাঁর নিজের দেশে এতো নিন্দামন্দ শুনেছিলেন বলে মনে পড়ছে না। হায়, খোদ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করেও তিনি বোধহয় তাদের দালালির উপযুক্ত হয়ে ওঠেননি।

ড. ইউনূসকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। এখন থেকে ২০ বছর আগে যখন পরবাসী হয়েছি সেই সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকও এমন বিশাল প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি, সে সম্পর্কে বিশেষ জানা ছিলো না। তাঁদের সম্পর্কে আমার জানা সবই পত্রপত্রিকা পড়ে, ইন্টারনেটের কল্যাণে। ড. ইউনূস বা তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাফাই গাওয়া আমার করণীয় কর্তব্যের অন্তর্গত নয়, কোনো দায়ও নেই। তারপরেও বলতে হয়, ড. ইউনূস ও তাঁর প্রতিষ্ঠান গত ৩০ বছর ধরে পরিশ্রম করেছেন বলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের সংসারের হতশ্রী চেহারায় সচ্ছলতার আলো এসেছে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো যাদের উঠে দাঁড়ানোর মতো কোনো অবলম্বন ছিলো না তাদের হাতের নাগালে এলো দারিদ্র্যমুক্ত হওয়ার সুযোগ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জন্ম-জন্মান্তরের অবহেলিত ও বঞ্চিত নারীদের সক্ষমতার বিকাশ ঘটালেন। তার কোনো মূল্য নেই? গ্রামীণ ব্যাংক বা তার কার্যক্রম সর্বতোসুন্দর বা নিখুঁত না হতে পারে, তাদের কর্মপদ্ধতিতে অনেক ভ্রান্তিও থাকা সম্ভব। কিন্তু তার সাফল্য ও অর্জনকে কীভাবে এবং কোন যুক্তিতে অস্বীকার করা যাবে?

গ্রামীণ ব্যাংক বিষয়ে একটি তথ্য সচরাচর চেপে যাওয়া হয় যে এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ড. ইউনূস বা তাঁর পরিবারের নয়। যতোদূর জানি, এটির ৯৪ শতাংশের মালিক এর ঋণগ্রহীতারা এবং বাকি ৬ শতাংশ বাংলাদেশ সরকারের। আর বছরের পর বছর একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়া যেন খুব নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। যেন লোকসান হলেই ভালো হতো। কিন্তু ব্যাংকের মুনাফা যাচ্ছে কার কাছে? মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যটি সত্য হলে ইউনূস বা তাঁর পরিবারের কাছে যাওয়ার কথা নয়। নিন্দুকরা কিন্তু সে বিষয়ে নীরব থাকেন।

ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের এই সাফল্যে সারা বাংলাদেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলি কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। কারণটি খুবই বোধগম্য। গ্রামীণ ব্যাংক নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করেছে এবং সফল হয়েছে (ঋণ গ্রহীতাদের ৯৬ ভাগ নারী), যা ওই রাজনীতির পরিপন্থী (ধর্মের পরিপন্থী বলে প্রচার করা হয় বটে, তাতে কোনো যুক্তি নেই তা সবারই জানা)। সুতরাং তাদের খুশি হওয়ার কারণ নেই।

আরেক দিকে আছেন বাম তাত্ত্বিকরা, যাঁরা শুধুই তাত্ত্বিক এবং কর্মে যাঁদের কিছুমাত্র আগ্রহ বা সাফল্য কখনো দেখা যায়নি এই বাংলাদেশে। সম্ভবত তাঁদের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির সারমর্ম এরকম : মাথার চুল হাত দুটোকে বলছে, তোমরা মোটেই কোনো কাজের না, কতো যে ভুলভাল করো সারাক্ষণ! উত্তরে হাত বললো, ভাই মাথার চুল, আমরা দশটা কাজ করি, তাতে দুটো ভুল হতেই পারে। তোমার তো কোনো কাজই নেই, ভুল করবে কী করে?

ড. ইউনূস কাজই করেছেন, ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সবক্ষেত্রে সুবিচার করাও হয়তো তাঁর বা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁদের কর্মকাণ্ড নিয়ে সাধারণ যে অভিযোগগুলি শোনা যায় তা হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার অত্যন্ত চড়া (আয়সঞ্চারী ঋণই এই আওতাভুক্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুদবিহীন ঋণও দেওয়া হয় যা নিন্দুকরা উল্লেখ করেন না), ঋণ আদায়ে ক্ষেত্রবিশেষে জবরদস্তি ও পীড়ন, গ্রামীণ ফোনের কলচার্জের উচ্চহার ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো, গ্রামীণ ব্যাংকেরও কি সরকারি ব্যাংকগুলোর মতো ঋণখেলাপি উৎপাদনের কারখানা হওয়া জরুরি? গ্রামীণ ফোনের কলচার্জ কি অন্য মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তুলনীয়/প্রতিযোগিতামূলক না হলে লোকে তাদের কাছে যায় কেন? এইসব অভিযোগ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা বা দেনদরবার করার চেষ্টা কখনো হয়েছে? তাঁদের ভুলগুলো নির্দেশ করে তা শোধরানোর পরামর্শ কি দেওয়া হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে অভিযোগগুলির সুরাহার আর কি পথ আছে? শুধু নিন্দামন্দ করে কিছু হওয়ার কথা নয়।

ড. ইউনূস বা গ্রামীণের মডেল সবার পছন্দ না-ও হতে পারে, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এর বিপরীতে যাঁরা অনেক কথা বলছেন, তাঁদের মডেলটি ঠিক কীরকম? তার প্রয়োগ কোথায়?

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে গ্রামীণ ব্যাংক অনেক অন্যায়-অনাচার করেছে, ড. ইউনুস গরিবদের গরিবি নিয়ে ব্যবসা করছেন। তবুও তাঁদের হাতে গত তিরিশ বছরে একশোটি হতদরিদ্র পরিবারেও (সংখ্যাটি কয়েক লক্ষ বলে আমরা জানি) যদি তিনবেলার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে এবং তারা সচ্ছলতার মুখ দেখে থাকে – সেই সাফল্যকে অস্বীকার করবো কী দিয়ে? এখন নিন্দুকরা অন্তত দশটি দরিদ্র পরিবারকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে সক্ষম হলে (তাঁদের নিজস্ব মডেল অনুযায়ীই হোক) আমরা তাঁদের কথা গ্রাহ্য করতে এবং তাঁদের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে ইচ্ছুক, না হলে নয়।

এখন থেকে প্রায় শ'খানেক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয় নিয়ে অনেক বিরূপ কথাবার্তা হয়েছিলো, রঙ্গ-ব্যঙ্গও কিছু কম হয়নি। কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যাচ্ছে, নিন্দুকদের কথা কেউ মনেও রাখেনি। কারণ কর্ম এবং অর্জনই টিকে থাকে, অকর্মণ্যের খেদ-জ্বালা নয়।

ডালাস, অক্টোবর ১৭, ২০০৬